MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
রেজি. নং ডিএ ১৩২৬ : ২০তম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০২২; জানুয়ারি ২০২৩
দাম : দশ টাকা

ইরানের লড়াই মৌলবাদ-ফ্যাসিবাদ হটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার

অবশেষে ইরানের নারীদের দীর্ঘ দুই মাসের বেশি সময় ধরে চলা ধারাবাহিক আন্দোলনের একটা প্রাথমিক বিজয় অর্জিত হলো। দেশটির অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ জাফর মনতাজেরি বলেছেন, 'ইরানের বিচার বিভাগের সঙ্গে নীতি পুলিশের কোনো সম্পর্ক নেই। এটি বিলুপ্ত করা হচ্ছে।' যদিও ইরানের সরকারি সংবাদ মাধ্যম বলেছে 'নীতি পুলিশসহ বিভিন্ন বাহিনী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেখে। এটি বিচার বিভাগ দেখে না'। কিন্তু রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইনি প্রশাসক যখন একথা বলতে বাধ্য হয় তখন এটা নিশ্চয়ই বোঝা যায় যে, এই আন্দোলন গোটা ইরানজুড়ে এক পরিবর্তনের আভাস দিচ্ছে।

ইরানের বৃহত্তম শহর, তেহরানে, মাসা আমিনি নামের একজন বাইশ বছর বয়সী কুর্দি নারীকে, ইরানের 'নৈতিকতা পুলিশ' হিজাব যথাযথভাবে না-পরার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছিল। পুলিশ হেফাজতে তাকে মারধর করা হয় এবং তিন দিন পর, সে মারা যায়। ইরানের জনগণ, বিশেষ করে তরুণ ইরানি নারীরা দ্রুতই এর প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু প্রথমে যাকে প্রতিবাদ হিসেবে দেখা হয়েছিল তা একটা স্ফুলিঙ্গের মতো গোটা ইরানে ছড়িয়ে পড়েছে, যা দেশটি চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় দেখেনি। নারীরা তাদের দাবিতে সামনের সারিতে বুক চিতিয়ে লড়াই করছে।

ইরানের বেশিরভাগ আন্দোলনের অগ্রভাগে নারীরা থাকেন, তবে এই প্রথমবারের মতো লিঙ্গ সহিংসতা এবং বৈষম্য বন্ধ করাসহ নারীদের দাবি নিয়ে আন্দোলন গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। নারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে কয়েক দশক ধরে চলা সংগ্রামের অংশ হিসেবেই সমানাধিকারের দাবিতে এই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। এই আন্দোলন শুধুমাত্র হিজাব সঠিকভাবে না পরার জন্য ইরানের সরকার কর্তৃক একজন তরুণীকে হত্যার প্রতিবাদ করার জন্য নয়; বরং এটি ইরানে কয়েক দশক ধরে চলা লৈঙ্গিক নিপীড়ন এবং মিসজিনিস্ট নীতির চূড়ান্ত পরিণতি, যা দ্রুত একটা বৈপ্লবিক পরিণতি নিচ্ছে।

১৯৭৯ সালের সামরিক শাসক রেজা শাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছিল, তাতে যুক্ত ছিল ইরানের কমিউনিস্ট পার্টিসহ বিভিন্ন বামপন্থি শক্তিসমূহও। কিন্তু আন্দোলনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে সহিংসতা এবং বর্বরতার মাধ্যমে আয়াতুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বে মোল্লাতন্ত্র ক্ষমতা

দখল করেছিল। যাকে কথিত ইসলামি বিপ্লব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সে সময় হত্যা করা হয় বহু কমিউনিস্ট ও বামপন্থি নেতা-কর্মীকে। এরপর থেকেই নেমে আসে গোটা ইরানজুড়ে অবর্ণনীয় দমন-পীড়ন ও নির্যাতন। আয়াতুল্লাহ খোমেনি হিজাব কোডকে বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেন, নারীদের চুল ও শরীর ঢেকে রাখতে বাধ্য করেন। মোল্লারা চূড়ান্ত নারী অধিকার বিরোধী শরিয়াহ আইন অনুমোদন করে। বিষয়টি দণ্ডবিধির ৬৩৮ নম্বর অনুচ্ছেদ হিসেবে যুক্ত করা হয়। ১৯৮৩ সাল থেকে নিয়মের লঙ্ঘনে তিন ধরনের শাস্তিও ঠিক হয়, দুই মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ৫ লাখ রিয়াল পর্যন্ত জরিমানা অথবা ৭৪টি পর্যন্ত বেত্রাঘাত। নিয়ম মানানোর জন্য ২০০৪ সালের পর থেকে বিশেষ বাহিনীও প্রস্তুত হয়, ইরানে যা 'গশতে এরশাদ' নামে পরিচিত। 'গশতে এরশাদ' নিয়মিত রাস্তাঘাটে টহল দেয়। এ রকম 'তদারকি টহল' দল 'বে-ঠিক' পোশাক-আশাকের জন্য নিয়মিত অনেককে আটকও করে। আটককৃতদের যেখানে নেওয়া হয়, তার দাপ্তরিক নাম 'এডুকেশন সেন্টার'। সেখানে কিছু বাধ্যতামূলক বক্তৃতা শুনতে হয়। পরিবারকেও ডেকে আনা হয় অনুরূপ উপদেশ শোনার জন্য।

ইরানের নারীরা তাঁদের স্বাধীনতার উপর এই আক্রমণ সহজে মেনে নেয়নি। ১৯৭৯ সালের ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে, কথিত বিপ্লবের কয়েক সপ্তাহ পরেই হাজার হাজার নারী তাদের স্বাধীনতার উপর এই আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং নতুন ধরণের লৈঙ্গিক নিপীড়ন এবং শরিয়াহ আইনের বিরুদ্ধে বিশাল বিক্ষোভের আয়োজন করেছিল। তাদের প্রধান স্লোগান ছিল 'যে বিপ্লব আমাদের পিছিয়ে দেয়, তা আমরা চাই না' এবং 'সমতা, সমতা, চাদরও না, মাথার স্কার্ফও না'। এই বিক্ষোভকে নির্মমভাবে দমন করা হয়।

১৯৭৯ সালে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল এবং বর্তমানেও ইরানে ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা কেবল বাধ্যতামূলক হিজাব পরিধানের আইনের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন নয়। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৭৯ সালের কথিত ইসলামি বিপ্লবের পরে, ইরানি সমাজে নারীদের ভূমিকা ক্রমেই সীমিত হয়ে আসছিল। বিভিন্ন সময়ে ঐতিহাসিক আন্দোলনের মাধ্যমে নারীদের অর্জিত অনেক অধিকার হরণ করে এখন কথিত ইসলামপন্থি নেতারা নারী-পুরুষের বিভাজন সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের শুরু থেকে, রাষ্ট্র হিজাব কোড এবং ইসলামি আইনগুলিকে মূল্যবান সামাজিক রীতিনীতি ও আচরণ হিসাবে প্রচার করে আসছিল। আর এই কাজে গণমাধ্যম, শিক্ষা ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় নীতি এবং আইনি ব্যবস্থাসহ সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে তারা ব্যবহার করেছিল।

'নৈতিকতা পুলিশ' হচ্ছে এমনই একটা প্রতিষ্ঠান যা নারীকে নিপীড়নের জন্য রাষ্ট্র তৈরি করেছিল। এরা স্ট্রিট গাইডেন্স টহল নিয়মিতভাবে দিয়ে পাবলিক জায়গায় ঘোরাফেরারত নারীরা যেন হিজাব কোড পালন করে তার তদারকি করে এবং প্রসাধনী ব্যবহারে সক্রিয়ভাবে নিরুৎসাহিত করে। প্রায় সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সকল পাবলিক বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এধরণের নৈতিকতা রক্ষাকারীরা বিদ্যমান, যারা শুধুমাত্র মহিলাদের পোশাক কোডই নয়, বরং শরিয়াহ অনুযায়ী নারী এবং পুরুষদের আচরণও দেখভাল করে!

ইরানে কয়েক দশক ধরে চলা এই লৈঙ্গিক নিপীড়ন এবং পুরুষতান্ত্রিক নীতির ফল নারীর জীবনের প্রতিটি দিককে স্পর্শ করেছে। নিয়ম করে সকল পাবলিক জায়গায় স্কুল, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, বিশ্ববিদ্যালয়, বিনোদনের স্থান এবং কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যমূলক বিধান প্রয়োগ করা হয়েছে। ফলে, নারীদের আরও বেশি প্রান্তিক অবস্থায় ঠেলে দেওয়া হয়েছে। তাদের কাজ এবং শিক্ষাগত অবস্থা আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। কথিত ইসলামি বিপ্লবের পর কয়েক দশক ধরে, নারীদের নিয়মিতভাবে তাদের পোশাক, আচরণ এবং জীবনযাপনের ধরণের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কর্মস্থল থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কী ধরণের বিষয় নারীরা পড়বে এবং কোন ধরণের চাকরি করবে সেগুলোও নিয়ম করে দেয়া হয়েছিল। নির্ধারিত ধরণের বাইরে অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁদের বাধা দেয়া হচ্ছিল।

১৯৮০ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নারী শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বেড়েছে। তবে উচ্চশিক্ষিত নাগরিক হিসেবে কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য বাড়তি সুযোগের সৃষ্টি হয়নি বরং তা কমেছে। ইসলামি বিপ্লবের আগে, ১৯৭৬ সালে, মহিলাদের স্বাক্ষরতার হার ছিল ৩৫%, যেখানে শ্রমশক্তিতে তাদের অংশগ্রহণ ছিল ১২.৯%। ১৯৮৬ সালে ইরানে মাত্র ৮.২% নারী কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন, যখন স্বাক্ষরতার হার ছিল ৫২%। সাম্প্রতিক সময়ে ২০১৬ সালে শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল ১৪.৯% যদিও স্বাক্ষরতার হার ছিল তখন ৮২.৫%। কয়েক দশক ধরে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের চিত্তাকর্ষক অগ্রগতি সত্ত্বেও, ইরানের বেশিরভাগ দরিদ্র জনগণই নারী, যারা শরিয়াহ আইনের অধীনে, অর্থনৈতিকভাবে পুরুষদের উপর নির্ভরশীল। এভাবেই দশকের পর দশক ধরে ইরানের নারীরা যেসব অন্যায়-অবিচারের মুখোমুখি হয়েছেন তার মধ্যে দারিদ্র্যতা ও অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা একটি বড় বিষয়। ইরানের বর্তমান বিক্ষোভের পেছনে এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট। আবার জনসমাজে হিজাব বা প্যান্ট নিয়ে কঠোরতা কমার পক্ষে মতামত বাড়ছে। ইরানের পার্লামেন্টারি রিসার্চ সেন্টার (পিআরসি)-২০১৮-এর ২৮ জুলাই এ বিষয়ে তাদের ৩৯ পৃষ্ঠার এক জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তাতে দেখা যায়, মাত্র ৩৫ শতাংশ মানুষ এখন সরকারের 'ড্রেসকোড' কঠোরভাবে পালনের পক্ষে। ১৯৮৬ সালে এ সংখ্যা ছিল ৮৬ শতাংশ।

'ড্রেসকোড' নিয়ে ধারাবাহিক টানাপোড়েনের ভেতরই মাশার মৃত্যু হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে তীব্র ক্ষোভ থেকে বোঝা যাচ্ছে বিষয়টি নিয়ে সরকারের ভূমিকায় জনসমাজে অসন্তোষ জমাট বেধে ছিল। সেই অসন্তোষ বাড়ে যখন বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি 'ড্রেসকোড' লঙ্ঘন শনাক্ত করতে মুখাবয়ব শনাক্তকারী অত্যাধুনিক নজরদারি ক্যামেরা বসানোসহ আরও কিছু নির্দেশ দেন এবছরের ১৫ আগস্ট। ৫ সেপ্টেম্বর

’২২ আরব নিউজ, গার্ডিয়ানসহ বহু আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এ নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এ সময় থেকে হিজাবের বিরুদ্ধে কোনো অভিমত দেওয়াকেও শাস্তিযোগ্য করা হয়। রাইসির এ ঘোষণায় নারীদের গ্রেপ্তার বাড়ার শঙ্কা তৈরি করে।

শরিয়াহ আইন নিয়ন্ত্রিত পরিবার ও বিবাহব্যবস্থা ক্রমেই নারীর জীবনকে বিষিয়ে তুলেছিল। বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ এবং সন্তানদের হেফাজতে নারীদের অধিকার সংকুচিত করা হয়। সন্তানের জন্মসনদে শিশুর বাবার নাম থাকে, তাদের মায়ের নাম বাদ দেওয়া হয়। যার ফলে তাদের নিজের সন্তানদের উপর নারীদের আর আইনগত অধিকার থাকে না। বাল্য বিবাহ বৈধ করা হয়। একজন নারীর চাকরির পছন্দ, থাকার জায়গা বা দেশ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে তার স্বামীর অনুমতির উপর নির্ভর করে। বহুবিবাহকে বৈধ এবং উৎসাহিত করা হয়েছিল এবং কোন নারীকে যদি তার স্বামী ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষের সাথে থাকতে দেখা যায় তার জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান করা হয়েছিল। মৌলবাদী শাসকেরা মেয়েদের বিয়ের বয়স ধার্য করেছিল ৯ বছর। জনগণের প্রবল প্রতিবাদের সামনে পড়ে ২০০২ সালে পার্লামেন্ট মেয়েদের বিয়ের বয়স বাড়িয়ে করে ১৩ বছর। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও রয়েছে ব্যাপক বৈষম্য। স্বামী মারা গেলে তার সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার নগণ্য, মাত্র সাড়ে ১২ শতাংশ, কিন্তু স্ত্রী মারা গেলে, তার সম্পত্তি পুরোটাই পাবে স্বামী। পৈত্রিক সম্পত্তিতে মেয়ের ভাগ ছেলেদের অর্ধেক। বিচারবিভাগে মেয়েদের চাকরির কোনও অধিকার নেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও মেয়েদের দাঁড়ানো নিষিদ্ধ। এমন কথাও শাসকদের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয় মহিলাদের মস্তিষ্কের শক্তি পুরুষের অর্ধেক।

১৯৭৯ সালে মোল্লাতন্ত্র জেঁকে বসার পর থেকে, আইনগতভাবে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে নারীদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করা হয়েছে। তবে যে নারীরা শাসকদের পরিবারের অন্তর্গত এবং এই ধরণের পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যে বিশ্বাস করে তারা নানা সুবিধা পায়। যেমন, কিছু সরকারি পদে তাঁদের আসীন করা হলো। বিপরীতে ইরানের শ্রমজীবী নারীদের অবস্থা ক্রমাগত আরও নাজুক হচ্ছিল। নারীরা বিশেষ করে শ্রমজীবী নারী এবং জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু নারীরা কথিত ইসলামি শাসনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ইরানি নারীরা এসকল পরিস্থিতি কখনোই নীরবে মেনে নেননি। প্রথম থেকেই গত ৪ দশক ধরে নারীরা নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ও গোপনে নানা প্রতিবাদ করে আসছিল। কয়েক বছর আগে, ইংহেলাব স্ট্রিটের মেয়েরা ইরানে বাধ্যতামূলক হিজাবের বিরুদ্ধে রাস্তায় তাদের মাথার স্কার্ফ সরিয়ে প্রতিবাদ করেছিল। ইরানের রাস্তায় নারীদের এবং বিশেষ করে তরুণীদের, সাম্প্রতিক সময়ে মাথার স্কার্ফ অপসারণ এবং পুড়িয়ে ফেলা এর আগের বিক্ষোভেরই ধারাবাহিকতা।

বর্তমান আন্দোলনের মূল স্লোগান, ‘নারী, জীবন, স্বাধীনতা’। এই স্লোগান উদ্ভূত হয়েছে, স্বাধীনতা সংগ্রামরত তুরস্ক এবং সিরিয়ার কুর্দি নারীদের মধ্য থেকে। সেখানে কয়েক দশক ধরে জাতিগত বৈষম্য এবং পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, একই সাথে তারা লড়ছে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, অত্যাচার এবং মৌলবাদী সন্ত্রাসী আইসিস এর বিরুদ্ধে। ইরানি নারীদের এই আন্দোলনের বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে ইরানের বাইরেও বিভিন্ন দেশে। আন্দোলনের প্রথম সারিতে থাকা ইরানি নারীরা শুধু তাদের নিজেদের নিপীড়নের দিকেই নয়,

আফগান নারীদের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। মধ্যপ্রাচ্য এবং গোটা দুনিয়াজুড়েও নারীরা ইরানি নারীদের লড়াইয়ের সাথে সমর্থন ও সংহতি জানিয়ে রাস্তায় এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরব আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশ নানাভাবে এই আন্দোলনে সমর্থন ব্যক্ত করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করছে। কিন্তু ইরানের নারীরা দেশের মোল্লতন্ত্রের বিরুদ্ধে যেমন সোচ্চার একই সাথে তারা এই সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধি সম্পর্কেও সচেতন রয়েছে। কেননা এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার নিজের দেশেও নারীদের দীর্ঘদিনের অর্জিত অধিকারসমূহকে নানাভাবে সংকুচিত করছে। সম্প্রতি নারীদের গর্ভপাতের অধিকারকেও সেখানে খর্বকরা হয়েছে। তাছাড়া নারীকে পণ্যে পরিণত করা, নারী শরীরকে যৌনবস্তু হিসেবে ব্যবহার করা ইত্যাদিকে তারা নিয়মসিদ্ধ করে ফেলেছে। অর্থাৎ একদিকে মোল্লাতন্ত্র যেমন নারীকে খোলসবন্দি করে কূপমণ্ডুক করে রাখতে চায় আবার অন্যদিকে পুঁজিতন্ত্র নারীকে পণ্য করে মুনাফা অর্জনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। এই উভয়ের বিরুদ্ধে নারীকে তার মর্যাদা ও সমতার অধিকার নিয়ে লড়তে হবে।

গত কয়েক দশকে ইরানে নানা ইস্যুতেই অনেক প্রতিবাদ হয়েছে। ইরানি সমাজ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইরানের শাসকগোষ্ঠীর অদক্ষতা উন্মোচিত হয়েছে। এর ফলে আমরা দেখি ইরানে এখন প্রতি তিনজনের একজন ইরানি দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। এ বছরের জানুয়ারিতে প্রকাশিত সরকারি হিসাবে আগের ১২ মাসে জিনিসপত্র এবং বিভিন্ন সেবায় খরচ বেড়েছে ৪২ শতাংশ। জুনে এটা ৫৪ শতাংশে হয়েছে। ভয়াবহ করোনা পরিস্থিতির পর ইরানিরা এখন জিনিসপত্রের উচ্চমূল্যের মহামারিতে আছে। জার্মান সংবাদপত্র 'আনজেরে জাইট'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইরানের বামপন্থি দল 'তুদে পার্টি'র আন্তর্জাতিক মুখপাত্র মহম্মদ ওমিদভার জানাচ্ছেন, সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ইরানে ৪০ শতাংশের বেশি জনগণ দরিদ্র্যসীমার নিচে, বেকারত্ব ভয়াবহ, কোনও কোনও প্রদেশে তা ৭০ শতাংশের বেশি। এর সঙ্গে জুড়ে আছে শাসকদের সীমাহীন দুর্নীতি। সৌদি আরবের শাসকরা এবং আফগানিস্তানের তালেবানরা মহিলাদের উপর যে ধরনের ফতোয়া জারি করেছে, ইরানেও তাই, এমনকী তার নিজের শরীরের উপর নিজের অধিরকারটুকুও নেই। আবার অন্যদিকে অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাও জনগণের উপর চেপে বসে আছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় নীতিতে জনগণের মতামত বা অংশগ্রহণ থাকে না বললেই চলে। রাজনীতি ও অর্থনীতি দুই দিকের চাপে নাগরিকদের হতাশা টের পাওয়া গিয়েছিল গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে। তারা আর ভোট দিতে উৎসাহ দেখাচ্ছে না। অর্ধেকের বেশি মানুষ (৫২ শতাংশ) গত নির্বাচনে ভোট দিতে আসেনি। আগের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের চেয়ে সর্বশেষটায় ভোটার কমেছে ২৫ শতাংশ। অথচ বিপ্লবের পর গণভোটে ইরানে ৯৮ শতাংশ ভোট পড়েছিল। ভোটের প্রতি গণ-অনীহার এক কারণ নির্বাচনের মনোনয়ন প্রক্রিয়া। সমাজের নেতৃত্ব পর্যায়ে এমন অনেকে আছেন, যারা সংস্কারের পক্ষে এবং ভোটে প্রদিদ্বন্দ্বিতার যোগ্য। কিন্তু মনোনয়ন প্রক্রিয়া এত নিয়ন্ত্রিত যে তাতে উদারপন্থি কারও প্রার্থী হওয়ার সুযোগ কম। সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে খোমেনিই সেনাপতি নিয়োগসহ বিভিন্ন নীতিগত বিষয়ে একক সিদ্ধান্ত নেন। যা নিয়ে কোন প্রশ্নও করা যায় না। এই দমবন্ধ অবস্থার কারণেই সেখানে মাঝে মাঝেই সহিংস বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয় আর যা দমন করা হয় নৃশংস কায়দায়। ২০১৯ সালেও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভে প্রায় ১৫০০ ইরানি জনগণকে হত্যা করা হয়েছিল।

এর আগে ২০১৭ সালেও মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। সরকার, পার্লামেন্ট থেকে শুরু করে বিচারবিভাগ, ন্যাশনাল গার্ড এবং সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা, যাদের মূল কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষা, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল। বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে অসংখ্য শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হাফট টাপে আখভিত্তিক কৃষিশিল্প কমপেণ্ডক্স, আরকের হেভি ইক্যুইপমেন্ট প্রোডাকশন, পেট্রোলিয়াম শিল্পের ধর্মঘট, শিক্ষক ধর্মঘট, পেনশনার্সদের ধর্মঘট। ২০১৭-এর আন্দোলন নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ—এই আন্দোলন সরাসরি আঙুল তুলেছে পুঁজিবাদ সৃষ্ট দারিদ্র্য এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাবি ছিল ধর্মীয় প্রজাতন্ত্র নিপাত যাক, সুপ্রিম শাসক খোমেনির মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে, প্রেসিডেন্ট রৌহানির মৃত্যুদণ্ড চাই এবং তথাকথিত রেভুলিউশনারি গার্ডদের মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও নার্সরা আন্দোলনে ফেটে পড়েছে। কারণ, ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার জন্য তাদের কষ্টার্জিত স্বল্প সঞ্চয়ও হারাতে হয়েছিল। সব মিলে ইরান আগে থেকেই ছিল একটা বিক্ষোভের আগ্নেয়গিরি।

ইরানের শাসকেরা যেকোন প্রতিবাদকেই ধারাবাহিকভাবে সহিংস কায়দায় দমন করেছে। ইরানি জনগণের সম্মিলিত স্মৃতি নিপীড়ন ও অপমানে পূর্ণ। ইরানের চলমান এই আন্দোলনকে দমন করার জন্যও তারা নৃশংস কায়দায় মানুষ হত্যা করার পথ বেছে নিয়েছে। এর মধ্যেই ইরান সরকার প্রায় ৪০০ জনকে হত্যা করেছে, যাদের মধ্যে প্রায় ৫০ জন শিশু। সরকারিভাবেই বলা হয়েছে প্রায় ২০০ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১৬ হাজার ৮০০ জনকে। সম্প্রতি এক বিক্ষোভকারীকে বিক্ষোভের অপরাধে ফাঁসি দেয়া হয়েছে। জাহেদান অঞ্চলে বেলুচ জনগোষ্ঠীর মসজিদে বোমা মেরে প্রার্থনারত প্রায় ৯৫ জন মানুষকে হত্যা করা হয়েছে গত সেপ্টেম্বরের ৩০ তারিখ। ইরানের ৩১টি প্রদেশের ৩০টি প্রদেশেই বিক্ষোভ চলছে। রাষ্ট্রের এই সহিংস সন্ত্রাসী তৎপরতা যত বাড়ছে তার একটা বিপরীত প্রভাবও লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা হলো— ইরানি বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ছে।

‘এটি একটি নারী বিপ্লব, পুরো ব্যবস্থাটি লক্ষ্য’ এবং ‘এটিকে প্রতিবাদ বলবেন না, এটিকে একটি বিপ্লব’ এধরনের স্লোগানগুলি শুধু নারী অধিকার নয় বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে। ইরানের এই আন্দোলন লিঙ্গ, জাতীয়তা ও ধর্মের সীমানা অতিক্রম করে আরও বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনের রূপ নিচ্ছে। মাশা আমিনিকে নিয়ে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও সম্প্রতি ইরানের সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা বেলুচ নারীরাও এই আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার কথা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে। যারা ব্যাপক সংখ্যায় আন্দোলনে যোগ দিচ্ছেন তাদের মধ্যে রয়েছে তরুণরা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, এছাড়াও শিল্পী, অভিনেতা-অভিনেত্রী, ক্রীড়াবিদ, সাংবাদিক বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ। একটি সমতার সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নিজেদে সংহতি জানিয়ে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলায় অংশ নেয়া ইরানের ফুটবল দল তাঁদের ম্যাচ শুরুর সময় জাতীয় সঙ্গীতে কণ্ঠ না মিলিয়ে প্রতিবাদ করার এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে। গ্যালারিতে ইরানের জনগণ রাষ্ট্রের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে পোস্টার তুলে ধরেছে।

ইরানের অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা বেশ কিছু শ্রমিকেরা আন্দোলনকে সমর্থন করে ধর্মঘটের ডাক দিচ্ছে। শিক্ষক ও শ্রমিক ইউনিয়নগুলো আন্দোলনের পক্ষে রাস্তায় নেমেছে। সাম্প্রতিককালে আসালুয়ে এবং আবাদান পেট্রোকেমিক্যালের প্রমিকদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আসলে নৈতিকতা পুলিশ কর্তৃক মাশা আমিনীর হত্যাকাণ্ডটি ছিল এক স্ফুলিঙ্গ যা কয়েক দশক ধরে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের আগুনকে বিস্ফোরণে পরিণত করেছে।

ইরানের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সমর্থন ও সক্রিয়তাই এই আন্দোলনের শক্তি। এই আন্দোলন ইরান ও মধ্যপ্রাচ্যের বৈষম্য ও প্রতিক্রিয়ার সমগ্র কাঠামোকে উন্মোচিত করেছে এবং তা পরিবর্তনের লক্ষ্য ঘোষণা করেছে। এর মানে এই নয় যে, আমরা শীঘ্রই এর বিপ্লবাত্মক ফলাফল দেখতে পাব; সমাজে এখনও অনেক মানুষ আছে যারা স্বাধীনতার স্লোগান ও আন্দোলন নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। এর মানে এই নয় যে, আন্দোলনবিরোধী দলগুলো সক্রিয় নয়, তারা আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে পারে, ইরানের মোল্লাতন্ত্র এই আন্দোলনকে কঠোর এবং নৃশংসভাবে দমন করতে পারে। সমস্ত বাস্তব হুমকি এবং শর্তসহ একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ইরানসহ গোটা মধ্যপ্রাচ্যের অন্ধকার যুগের অবসানের শুরু মনে হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি।